

১৬.দাউদ আলাইহি সালাম এবং জিহাদ (প্রথম পর্ব:- যুদ্ধের জন্য শক্তি অর্জন)

একাধিক হাদিসে দাউদ আলাইহিস সালামের নামায ও
রোযাকে সর্বোত্তম নামায-রোযা আখ্যায়িত করা হয়েছে।
প্রখ্যাত সাহাবী আমর বিন আস রাযি. এর ছেলে আব্দুল্লাহ
প্রতিদিন রোযা রাখতেন, সারারাত তাহাজ্জুদ পড়তেন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন,

إنك إذا فعلت ذلك، هجمت له العين، ونهكت لا صام من صام
الأبد، صوم ثلاثة أيام من الشهر، صوم الشهر كله» قلت: فإني
أطيع أكثر من ذلك، قال: «فصم صوم داود، كان يصوم يوماً
ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى

“তুমি এরূপ করলে চোখ বসে যাবে এবং শরীর দুর্বল হয়ে
পড়বে। যে সারা বছর রোযা রাখলো সে যেন কোন রোযাই
রাখলো না। মাসে তিন দিন রোযা রাখো, সারা বছর রোযা
রাখার সওয়াব পাবে। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী
করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি দাউদ
আলাইহিস সালামের মতো রোযা রাখো, তিনি একদিন রোযা
রাখতেন আর একদিন ছেড়ে দিতেন এবং শত্রুর মুখোমুখি
হলে পলায়ন করতেন না। -সহিহ বুখারী, ৩৪১৯ সহিহ

হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

في قوله: "ولا يفر إذا لاقى" إشارة إلى حكمة صوم يوم وإفطار يوم، قال الخطابي: محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقى بعض القوة لغيره، وقد أشير إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في داود عليه السلام "وكان لا يفر إذا لاقى" لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد. فتح الباري لابن حجر 4)/ 221)

“শত্রুর মুখোমুখি হলে পলায়ন করতেন না” এতে একদিন রোযা রাখা আর একদিন রোযা ছেড়ে দেয়ার হিকমত- কারণের দিকে ইশারা রয়েছে। খত্তাবী রহ. বলেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন আমরের ঘটনার খোলাসা হলো, আব্দুল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে শুধু রোযা রাখার আদেশ দেননি। বরং তাকে আরো অনেক প্রকার ইবাদতের হুকুম দিয়েছেন। যদি সে রোযাতেই সব শক্তি ব্যয় করে ফেলে তবে অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে ক্রটি হবে। তাই উত্তম হলো, রোযার ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন যেন অন্যান্য ইবাদতের জন্যও কিছু শক্তি বাকী থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম “শত্রুর মুখোমুখি হলে পলায়ন করতেন না” -এ কথা বলে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন, কেননা দাউদ আলাইহিস সালাম একদিন পর পর রোযা ছেড়ে দিয়ে জিহাদের জন্য শক্তি অর্জন করতেন। -ফাতহুল বারী,
৪/২২১

হাদিস ও হাদিসের ব্যাখ্যা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জিহাদের জন্য শক্তি অর্জন নবীদের সুন্নাহ। এমনকি তাহাজ্জুদ-রোযা ইত্যাদিও এ পরিমাণ করা যাবে না যে, এতে শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং জিহাদের শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। এর উপর কিয়াস করে বলা যায়, ইলম অর্জনেও এ পরিমাণ ব্যস্ততা কাম্য নয়, যার কারণে জিহাদ করা যায় না, বিশেষ করে যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়।

আসলে এ উম্মত হলো জিহাদী উম্মত। জিহাদ এ উম্মতের মাঝে সর্বদা চলমান থাকবে, থাকতে হবে, এটা তার অস্তিত্বের প্রশ্ন। তাই এ উম্মতকে জিহাদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই অন্যান্য আমল ও দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করতে হবে। এজন্যই ইসলামে গণীমত হালাল করে দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য হারাম ছিল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ বলেন,

أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَبْعَثُونَ لِيَأْتُوا قَوْمَهُمْ خَاصَّةً، وَهُوَ مُحْصَرُونَ يَتَأْتَى الْجِهَادَ مَعَهُمْ فِي سَنَةٍ أَوْ

سنتين ونحو ذلك، وكان أممهم أقوىاء يقدرّون على الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة، فلم يكن لهم حاجة إلى الغنائم، فأراد الله تعالى ألا يخلط بعملهم غرض دنيوي، ليكون أتم لأجورهم، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، وهم غير محصورين، ولا كان زمان الجهاد معهم محصوراً، وكانوا لا يستطيعون الجمع بين الجهاد والتسبب بمثل الفلاحة والتجارة، فكان لهم حاجة إلى إباحة الغنائم حجة الله البالغة (1/217)

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহির পূর্বের নবীগণ নির্দিষ্ট জাতির কাছে প্রেরিত হতেন, যাদের সংখ্যা হতো সীমিত। তাদের সাথে বছরে দুয়েকবার জিহাদ হতো। তাছাড়া তারা ছিল শক্তিশালী জাতি, তারা জিহাদের পাশাপাশি ব্যবসা ও ক্ষেতখামারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো। তাই তাদের গণীমতের প্রয়োজন ছিল না। ফলে আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন তাদের আমলের সাথে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ না ঘটুক, যেন তারা পূর্ণ সওয়াব অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে আমাদের নবীকে পাঠানো হয়েছে পুরো মানবজাতির জন্য, যাদের সংখ্যা অসীম এবং তাদের সাথে জিহাদের সময়ও সার্বক্ষণিক, নির্দিষ্ট নয়। তাই তারা ব্যবসা ও ক্ষেতখামারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে না। এ কারণে তাদের জন্য গণীমত হালাল হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।” -হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১/২১৭

এখন তো ইলম অর্জনের জন্য জিহাদের সমর্থনও করা যায় না, কারণ তাহলে জেল-জুলুমের শিকার হতে হবে, ইলম

অর্জনে বিঘ্ন ঘটবে। কিন্তু ফরযে আইন মানলে তো আবার বসে বসে ইলম চর্চার সুযোগও থাকে না। তাই ফরযে আইনও মানা হয় না। বা মানলেও ফরযে আইনের এ অর্থ ‘হার হার ফরদ পর ফরয’ (প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয) মানা হয় না। নতুন নতুন অর্থ আবিষ্কার করা হয়। সত্যিই প্রশ্ন জাগে, যে ইলম আমলের সহায়ক না হয়ে তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এমনকি সে ইলমের জন্য খোদ ইলমের মধ্যেও তাহরীফ-বিকৃতি করার প্রয়োজন পড়ে, সে ইলম আসলে কার জন্য? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না কি দুনিয়াবী পদ, অর্থ ও সম্মানের জন্য।

কখনো জিহাদের দাওয়াত দেয়া হলে রুচির ভিন্নতার অজুহাত তোলা হয়। বলা হয়, তাদের রুচি হলো জিহাদ আর আমাদের রুচি হলো ইলম। রুচির ভিন্নতা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু ফরযে আইন জিহাদ বাদ দিয়ে রুচির অনুসরণে ইলম অর্জন- এটা কি আল্লাহর হুকুমের পরিবর্তে নিজের রুচি ও প্রবৃত্তির পূজা নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

“তুমি কি দেখেছো তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ

তাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছেন এবং তার কান ও
অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন আর তাদের চোখের উপর
পর্দা ফেলে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর পর এমন কে
আছে, যে তাকে সুপথে নিয়ে আসবে? তবুও কি তোমরা
শিক্ষা গ্রহণ করবে না।” -সূরা জাছিয়া, ২৩

কেউ আবার নিজের উর্বর মস্তিষ্ক খাটিয়ে জিহাদ হতে বসে
থাকার অত্যাশ্চর্যজনক অজুহাত বের করেন। বলেন,
ইসলামী হুকুমত থাকলেও তো আমিরুল মুমিনীন সকলকে
জিহাদে যেতে বলবেন না, কিছু লোককে তো তিনি ইলম
অর্জনে লাগিয়ে রাখবেন, তাই আমরা ইলম অর্জনে লেগে
রয়েছি। কিন্তু এই উর্বর মস্তিষ্কের লোকটিকে কে বুঝাবে,
আমিরুল মুমিনীন যাদেরকে ইলম অর্জনে লাগাবেন তাদের
দায়িত্ব কি হবে বসে বসে আমিরুল মুমিনীনের জিহাদের
বিপক্ষে ফতোয়া প্রদান করা, জিহাদ হতে মানুষকে
নিরুৎসাহিত করা, না কি জিহাদের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত
করা, জিহাদের প্রয়োজনীয় মাসায়েল আমিরুল মুমিনীনকে
সরবরাহ করা? আমরা তো মুহতারাম আলেমদের নিকট
এতটুকুই আবেদন করছি। আমরা তাঁদের অস্ত্র হাতে নিয়ে
ময়দানে নামতে বলছি না। আমরা বলছি, আপনারা
জিহাদের বিষয়েও একটু ইলম অর্জন করেন। কেন এমন
হয় যে, আমরা যখন জিহাদ বিষয়ক কোন প্রবন্ধ আপনাদের

সামনে পেশ করি তখন আপনারা কিছু ইশকাল-আপত্তি করে তার তাহকীকের দায়িত্ব আমাদেরকে দিয়ে দেন। আর নিজেরা শুধু চাঁদের মাসয়ালা, *মুরসাল হাদিস হুজ্জত-দলিল কি না? রফয়ে ইদাইন-আমিন বিল জাহর ইত্যাদি সাধারণ মাসয়ালা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। তবে কি জিহাদ বিষয়ে ইলম অর্জনের দায়িত্ব শুধু আমাদের? কেন এ বিষয়ে অধ্যয়নের প্রতি আপনাদের কোন আগ্রহ নেই? আল্লাহ মাফ করুন, আপনাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে আপনারা ভয় পান। কারণ যদি পড়াশোনা করে হক স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো জেল-জুলুম ও ইবতেলা-পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তাই আপনারা কাফেরদের মতো হকের দাওয়াত না শোনার জন্য কানে আগুল দিয়ে রাখতে চান।

এসবই নাহয় বাদ দিলাম, আপনারা কি এটাও জানেন না যে, বর্তমান মুসলিমরা জিহাদকে ঘৃণা করে, অনেকে হদ-কিসাসকেও ঘৃণা করে, বর্বরতা মনে করে। তো শরিয়তের কোন বিধানকে ঘৃণা করা কি কুফর নয়? তাহলে আপনারা তাদের ঈমান ঠিক করা এবং কুফর হতে তাঁদের বাঁচানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন। না কি আপনারা জিহাদের ব্যাপারে নিজেদের ঈমান ঠিক রেখে, নিজেরা বেঁচে যাবেন আর জনসাধারণকে তাদের ভ্রান্ত আকীদার উপর রেখে

দিবেন। এমনকি আপনাদের ঘনিষ্ঠ লোকদের, ভক্ত-মুরীদদের ঈমানটাও ঠিক করার চেষ্টা করবেন না। এটা কি তাদের সাথে গাদ্দারী-বিশ্বাসভঙ্গতা নয়। তারা তো আপনাদের সাথে সম্পর্ক রাখেই এ বিশ্বাসে যে, আপনারা তাদের ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাকের পরিশুদ্ধি করবেন। তারা আপনাদের যে হাদিয়া-তোহফা দেয় তাও এর বিনিময়েই দেয়। তো আপনাদের এই হাদিয়া বৈধ হয় কি না তাও ভাবার বিষয়। সা'দী রহ. সূরা তাওবার ৩৪ সংখ্যক আয়াতের তাফসীরে যা লিখেছেন সুযোগ হলে তা একটু দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইলো।

আচ্ছা, আপনারা তো তালেবানদের জিহাদকে সমর্থন করেন, কিন্তু আপনাদের ভক্ত-মুরীদদের কি অবস্থা? একটি ঘটনা শুনুন, তাবলিগের সাথে সম্পৃক্ত এক দ্বীনদার ব্যক্তি সে আবার বড় একজন পীর ও মুফতীর মুরিদও। তিনি এতই ভালো মানুষ যে শেষ বয়সে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য তিনি ঘর ছেড়ে মসজিদে পাড়ি জমিয়েছেন। মুফতী সাহেবও তার আগ্রহের কারণে মসজিদের সিঁড়ির নিচে তার থাকার জন্য একটি রুম তৈরি করে দিয়েছেন। একদিন ফযরের নামাযের পরে ইমাম সাহেব মুনাজাতে আফগানের মুজাহিদদের জন্য দোয়া করে তখন সেই বৃদ্ধ লোকটি প্রচণ্ড খেপে যান। রাগারাগি শুরু করেন। তার কথাবার্তা থেকে সুস্পষ্টরূপে

জিহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায়। মুফতি সাহেব ঘটনাটি জানানো হয়। তখন রমযান মাস ছিল, মসজিদে চল্লিশদিন ব্যাপী ইতেকাফ চলছিল। মুফতি সাহেব মসজিদে এসে সকলকে জড়ো করে জিহাদের ব্যাপারে একটি ভাষণ দেন। এতে সেই ব্যক্তির জিহাদের ব্যাপারে ভুল ধারণা দূর হয় এবং সে পরে যিনি দোয়া করেছেন তাকে বলেছেন যে, আপনাদের কারণে আমার অনেক বড় ভুল দূর হলো। ঘটনাটি আপনি বিশ্বাস করেন বা নাই করেন বাস্তবতা কি এমনটাই নয়। আলেমগণ তালেবানদের সমর্থন করেন, তালেবানদের বিজয়ে খুশি প্রকাশ করেন, কিন্তু পাবলিক কি তা সমর্থন করে? তাহলে পাবলিকের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করার জন্য তাঁরা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? আর এটাও কেমন সমর্থন যে, শুধু বিজয়ী হলেই সমর্থন প্রকাশ করা হবে, আর দুর্বল অবস্থায় মুখে কুলুপ এঁটে থাকা হবে, আর্থিক কোন সাহায্যও করা হবে না এবং যুবকদের জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করে তালেবানদের সহায়তাও করতে বলা হবে না।

উল্লেখ্য, মূল লেখার সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় আলেমদের কিছু অবস্থা তুলে ধরা হলো, এ বিষয়গুলো আলোচনার দ্বারা ফায়োদা হলো নিজেরা নিজেদের আকীদা-মানহাজে দৃঢ় হওয়া। তেমনিভাবে দাওয়াতের ময়দানেও এ বিষয়গুলো

দিয়ে উপকৃত হওয়া। কিন্তু এ ধরনের বিষয় আলোচনা করা হলে সাধারণত ভাইয়েরা জযবার কারণে আলেমদের যথেষ্ট গালমন্দ শুরু করেন। আমি ভাইদের দ্বিনি জযবা, দ্বিনের জন্য দরদ- এর প্রতি আন্তরিক সম্মান জানাই। কিন্তু এভাবে আলেমদের গালমন্দ করা ঠিক নয়। কারণ এ অঞ্চলে তাদের কুরবানী-আত্মত্যাগের মাধ্যমেই দ্বীন টিকে আছে। তাদের মাধ্যমেই আমরা ইলমে দ্বীন পেয়েছি, যে ইলমের মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ আজ আমরা হক-বাতিল নির্ণয় করতে পারছি। তাছাড়া প্রকাশ্যে তাদের গালমন্দ করার দ্বারা অনেকে আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই বিশেষভাবে পাবলিক প্রেসে কথা বলার সময় সতর্কতা অবলম্বন কাম্য। আল্লাহর আমাদের তাওফিক দান করুন।